সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 43 | No. 1 | 1999

Check for updates

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা : সংগ্রাম-কর্ষিত ভূমি

Volume	43
Issue	1
Year	1999
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Baitullah Quaderee
Published online	October 1, 1999
DOI	10.62328/sp.v43i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v43i1.8
Pages	121-134
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সিকান্‌দার আবু জাফরের কবিতা : সংগ্রাম-কর্ষিত ভূমি

বায়তুল্লাহ্ কাদেরী*

ত্রিশোত্তর বাংলা কবিতা কিংবা পশ্চিমবাংলার কবিতার সঙ্গে বাংলাদেশের কবিতা আজকে পৃথক হয়ে ওঠার দাবি করতে পারে তার সাংগ্রামিক জনপদকেন্দ্রিক উত্তাপময় বৈশিষ্ট্যের জন্যই। এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, বায়ান্ন, উনসত্তর, একাত্তর কিংবা নব্বই-এর গণআন্দোলন বাংলাদেশের কবিতায় এমন কিছু মাত্রা সংযোজন করেছে যা বাংলা কবিতায় এর পূর্বে প্রত্যক্ষীভূত হয়নি, হয়নি স্বাতন্ত্র্যসূচক।[১] ৪৭-পরবর্তী বাংলাদেশের কবিতায় যে মধ্যবিত্তের রূপায়ণ, হতাশাগ্রস্ত জীবন, নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি, রোম্যান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা প্রভৃতি অনুষঙ্গ লক্ষণীয়, সেটি নতুন নয় বরং তিরিশেরই অনুবর্তন। বলা যায়, একমাত্র নতুন ভূ-খণ্ডের উৎকেন্দ্রিকতা, রাষ্ট্র-উদ্ভূত সমস্যাক্রান্ত দীর্ণ সমাজ ও পারিপার্শ্বিক চারিত্রই বাংলাদেশের কবিতাকে ভিন্নতা দিয়েছে। বিভাগোত্তরকালে কোলকাতাকেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীদের অভিযোজনগত সমস্যা, শিল্পসত্তার যথার্থ দিকনির্দেশনাগত সংকট তাঁদের বৃহৎ দায়িত্বের সম্মুখীন করে। সমাজ, রাষ্ট্র, পারিপার্শ্বিকের দায়ে মসিও যে অস্ত্রতুল্য ঝাঁঝালো হতে পারে, বাংলাদেশের কবিতার তরঙ্গায়িত পংক্তিমালায় সেটি আজ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। আর এই জনকেন্দ্রিক শিল্পবোধে যিনি অগ্রগণ্য তিনি কবি সিকান্‌দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫)। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ভাষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতির সঙ্গে সিকান্‌দার আবু জাফরের সাহিত্যকীর্তির সম্পর্ক উজ্জ্বল হয়ে আছে। অর্থাৎ, জীবন-জীবিকা, সমাজ-রাষ্ট্র-শিল্পসত্তা যেখানেই তিনি অন্যায় প্রত্যক্ষ করেছেন, সেখানেই তিনি হয়েছেন প্রতিবাদী।

সিকান্‌দার আবু জাফরের কাব্যগ্রন্থ বিলম্বে প্রকাশিত হলেও তাঁর কবিসত্তার উন্মেষকাল চল্লিশের দশক। চল্লিশের কবিদের প্রধান অন্বিষ্ট হয়ে দাঁড়ায় ত্রিশোত্তর কবিদের ধূম্র, বিষণ্ন, বিপন্ন, বিস্বাদময় পৃথিবীর কাব্যভূমিতে স্বতন্ত্র শস্য ফলানো। তদুপরি রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও নাৎসি আন্দোলন, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্ভব, বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী উৎকেন্দ্রিক মানুষের অস্তিত্ব-সংকট এবং উত্তরণ-স্পৃহা, মন্বন্তর, ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ ইত্যাদি নানান ঘটনাস্রোত। এই ঘটনাপ্রবাহ চল্লিশের কবিদের কাব্য-ভাবনায় বিস্তৃত করে নতুন শিল্প-অন্বেষার প্রেরণা। শুধু রোম্যান্টিক অনুবর্তন নয়, জনজীবনের প্রতি কঠিন দায়বদ্ধতার সূত্রেই তাঁরা তাঁদের শিল্পপ্রেরণার মানদণ্ড নির্ধারণ করলেন। বলা প্রাসঙ্গিক, এই আত্মিক আলোড়ন-বিলোড়ন এ দশকের কবিদের ফেলে দেয় বিচিত্র প্রপঞ্চে। দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিষ্ঠা-পরবর্তী মোহভঙ্গের গাণিতিক বিন্যাসে কেউ-কেউ ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাকেই আরাধ্য শিল্প-

---

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

অনুষঙ্গরূপে গ্রহণ করলেন। আবার কেউ-কেউ প্রবল শ্রেণীচেতনা ও কালচেতনায় জারিত হয়ে সমাজ ও সামাজিকের প্রশ্নে উদার প্রগতিশীলতার ধ্বজাবাহী হলেন। বলাবাহুল্য, সিকান্দার আবু জাফর শেষোক্ত দলেই নিজের শিল্প-অস্তিত্বকে প্রোথিত করলেন। তবে মার্কসবাদী উদার মানবিকতায় সিকান্দার আবু জাফর স্থিত হননি। অনেকটা আপন শিল্পসত্তার অন্তর্তাগিদ তাঁকে মানবমুখী করেছিল। কারণ সিকান্দার আবু জাফরের মানসগঠন প্রক্রিয়ায় তাঁর *নৃতাত্ত্বিক-মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য* ও কালধর্ম ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। পূর্ব পুরুষের বিহার অঞ্চলের উত্তরাধিকার এবং এক ধরনের স্থানিক দ্রোহ তাঁর চেতনায় প্রাপণীয়, যা নজরুলের মধ্যেও লক্ষ করা যায়। সেই অর্থে সিকান্দার আবু জাফরের মানবিকতাকে আমরা দ্রোহসুলভ চেতনার প্রকাশ বলে ধরে নিতে পারি। মার্কসবাদীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও তেমনি চেতনাগত। একারণেই সিকান্দার আবু জাফর মুক্তি খুঁজে পেয়েছিলেন ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের মধ্যে। আবার তা পরবর্তীকালে রূপান্তরিতও হয়েছিল।

প্রসন্ন প্রহর, তিমিরান্তিক ও *বৈরী বৃষ্টিতে* এই ত্রয়ীগ্রন্থের প্রকাশকাল একই সঙ্গে, ১৯৬৫ সালে। তবে কাল পরম্পরাগত পার্থক্য গ্রন্থগুলোতে উল্লেখিত আছে। *প্রসন্ন প্রহরের* কবিতাগুলোর রচনা ১৯৪০-৪৭ কাল পরিসরে। বস্তুত, কবির ব্যক্তিগত জীবনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সামষ্টিক চেতনার স্ফুরণ এ-পর্বের কবিতাগুলোতে লক্ষ করা যায়। স্বপ্ন, কল্পনা আর অন্ধকারের অবসান-প্রত্যাশী চিত্তলোকের *কথাভাস* হয়ে উঠেছে এ-কবিতাগুলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সাম্যবাদী চেতনা, মানবকল্যাণবোধ এবং অশুভশক্তির বিভীষিকাময় অন্ধকার কবির কবিতাগুলোর মূল প্রতিপাদ্য। এ-গ্রন্থে কবি উচ্চারণে অনেকটাই শমিত, স্বাপ্নিক। অতীত-নস্টালজিক চেতনায় কবি বিশ্বযুদ্ধোত্তর স্বদেশকে আঁকেন—

> সেদিন পৃথিবী ছিলো না তো দুর্বহ।
> বাতাসে বাতাসে মৃত্যুর হাহাকার[১]

অথবা প্রকৃতির প্রতিকূলে মারণাস্ত্রের অসমবিন্যাস ও সর্বনাশকে কবি প্রকাশ করেন এভাবে—

> মারণ-মন্ত্রে মুখর-কণ্ঠ বোমারু বিমানগুলি
> সেদিন আকাশে হয়নি হাজার তারা।[২]

আর এ-সূত্রেই সিকান্দার আবু জাফর আপ্রথম প্রশ্নের সম্মুখীন হন। বিপন্ন মানবতা, কল্যাণধর্মিতার অভাব ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তির বিরুদ্ধে রাখেন শঙ্কাপূর্ণ প্রশ্ন—

> ধ্বংসের রাহু পেয়েছে রাজ্যভার।
> বিশ্বমানবতার
> দিক-দিগন্তে একি ক্ষমাহীন অকুণ্ঠ ব্যভিচার?[৩]

সিকান্দার আবু জাফরের কাব্য ভাবনার বিষয় মূলত মানুষ। মানবিক শৃঙ্খলার পক্ষে তিনি আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন। 'কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে মাটিতে শিকড় মেলে দাঁড়াবার চেষ্টাতেই বেশী ভরসা পাই। সমাজের একজন মানুষ হিসেবে সেই সমাজের আর দশজনের সঙ্গে কথা বলতেই আমার বেশী আনন্দ'[৪] — তাঁর এ বক্তব্যই এর প্রমাণ। কবি-সমালোচক আবদুল মান্নান সৈয়দের মতও প্রণিধানযোগ্য — 'সমাজমনস্ক তিনি, তাই তাঁর প্রধান অবলম্বন নিসর্গ নয়-মানুষ; তিনি পীড়িত মানবের কল্যাণের ধ্যানে উচ্চকিত ও মগ্ন : ভিতরের নির্জন ও অনচ্ছ মানুষটি নয়, বরং যে-মানুষ

সমাজসীমার বাসিন্দা তারই মঙ্গল তাঁর আরাধ্য'।[৫] সুতরাং মানুষের পৃথিবী আক্রান্ত হচ্ছে এক ভয়ানক অসুখে। দাঙ্গা, মহাযুদ্ধ, অত্যাচার-নিপীড়ন প্রভৃতির অনুষঙ্গে নেমে এসেছে বিভীষিকাময় রাত্রি; মানুষের ভাগ্যাকাশে উড্ডীন আজ 'রক্তপায়ী' শকুন। বাসনার উদ্দীপনা আর স্বেচ্ছাচারিতার নিপীড়ন মানবিক কল্যাণধর্মিতাকে গ্রাস করে চলেছে। কবিতায় তারই বর্ণনা—

সে-রাত্রির নীরবতা রোমাঞ্চ আনেনি
রক্তপায়ী শকুনেরা দিয়েছিল হানা,
বিবেকের সুন্দরের সম্ভ্রম জানেনি
সর্বজয়ী হয়েছিল উদ্ধত বাসনা।
সে-রাত্রির আলিঙ্গন বসন্ত আনেনি
এনেছিল শ্মশানের চরম রিক্ততা[৬]

কিন্তু কবি যেহেতু সামাজিকের প্রতিভূ, আর মসিও যেহেতু তাঁর মোক্ষম মারণাস্ত্র সেহেতু অন্যায়-অত্যাচারের বর্ণনাই তাঁর কর্ম নয়, সঙ্গে সঙ্গে আশার সঞ্জীবনী সুধাও তিনি পান করাবেন, দেখাবেন নিশ্চিত মুক্তির আলো। সিকান্দার আবু জাফর এই সত্যস্বরূপই প্রকাশ করেন তাঁর উচ্চারণে। "সিকান্দার আবু জাফরের বৈশিষ্ট্য হতাশায় নয়, নৈরাশ্যে নয়, আত্মসমর্পণে নয়, জীবনের পরাজয়কে অদৃষ্টের করুণায় সমাহিত করার মধ্যে নয়। জীবনের স্বরূপ তাঁর কাছে যেমন সত্য তেমন সত্য জীবন-সংগ্রামের রূপও, আর সে সংগ্রামের পরিণতি সম্পর্কেও তাঁর মধ্যে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত এই সংগ্রামী আর আশাবাদী চেতনাই তাঁর কবিতাকে মহিমান্বিত করেছে"।[৭] আর সে-কারণে সুদিন আসতে বাধ্য। ক্ষমাহীন ভবিষ্য সমস্ত অন্যায়ের অবসান ঘটাবে—

বর্ণহীন ভবিষ্যের রুক্ষ অভিশাপে
রাত্রির সীমান্তপারে তাদের সুদিন
সঙ্কুচিত হয়ে আসে কফিনের মাপে
এবার মিটবে যত অন্যায়ের ঋণ।[৮]

আর বিবিক্ত সমাজে, নৈরাশ্যে, করুণার বৃষ্টিহীন সমাজ-পঙ্কিলতায় কবির মানবপ্রেমই কবিকে আশ্বাস জোগায় ক্রমভঙ্গুর জীবনকে উগরে ফেলে নতুন করে বাঁচবার, জীবনের নতুন মাহাত্ম্য উপস্থিত হয়ে প্রেরণা জোগায়—

বহুরাত্রি ফিরে গেছে জীবনের আলোছায়া হতে
রেখে গেছে প্রেমহীন মুহূর্তের বিষতিক্ত স্বাদ,
তারি মাঝে যখন সহসা
এসেছে মধুর রাত্রি অশান্ত বিস্ময়ে,
তখন সহসা তুমি দিয়ে গেছ সাড়া।
কুণ্ঠাহীন মৃত্যু নিশাচর,
বারবার বলে গেছ অকম্পিত স্বরে
আমার প্রেমের পাশে আনন্দের পাশে
অন্ধকারে পূর্ণিমায় জীবনের পাশে
সত্য হয়ে আছো তুমি — নিত্য হয়ে আছো।[৯]

এক অর্থে *প্রসন্ন প্রহর* কবির সংক্ষোভ উচ্চারণের *গুটি বাঁধবার* কাল। নতুন ভূ-খণ্ডের স্বপ্নে বিভোর কবির মানসভূমিতে যে প্রগাঢ় অন্ধকার ঘিরে রয়েছে তারই *অবসানকল্পের মথিত উদ্গার* হচ্ছে এ-পর্বের কবিতা। সে-কারণেই রাত্রি, রাত্রি-অনুষঙ্গ, নখর-বিস্তৃত শকুনের ছায়া, উত্তেজিত শোণিতের টঙ্কার তাঁর কবিতায় রেখাঙ্কিত হয়ে যায়। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

রাত্রি আসে শব্দহীন পায়ে
উত্তেজিত হৃদয়ের সর্বপ্রান্তে আশঙ্কা ছড়ায়ে।[১০]

স্ফীত হয়ে ওঠে
রক্তবাহী প্রতিটি ধমনী।[১১]

রজনীর স্তব্ধ পাহারায়
ঘুম আসে। ঘুম ভেঙে যায়।[১২]

কিন্তু প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সীমানা মানুষের অজ্ঞাত। জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের প্রক্রিয়াও এ-কারণে ভিন্ন। নখর-বিস্তৃত শকুনের আবির্ভাব নভোমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দিন-রাতের প্রকৃত পরিচয় নিশ্চিহ্ন করে দিতেই যেন আসে বিভ্রান্তি—

এই দুই জীবনের এত কাছাকাছি
এতদিন আছি
চেনাজানা হ'ল না তো আজো কারো সাথে।
নিশীথে চেয়েছি আমি দিনের জীবন,
রাত্রির জীবন-ধারা চেয়েছি প্রভাতে।[১৩]

অর্থাৎ, জীবনের মোক্ষম প্রভাতে ঘোর তমসাচ্ছন্ন রাত্রিকে প্রত্যক্ষ করতে হয়; কিন্তু কবি এতে আশাহতও নন। যুক্তি বিচার ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি সময়োপযোগী হতে চান। কারণ, জীবনের তিমির সর্বৈব নয়, এর বিস্তারও নিরঙ্কুশ নয়, নয় চিরন্তন। সুতরাং অচিরেই আলোর প্রৌজ্জ্বল্যে নতুন দিনের সূর্যের উদ্ভাসন লক্ষ করা যাবে—

এই রাত্রির কোথা অবশেষ তোমাকে জানতে হবে
নিশান্ত-দেশে নব পূর্বাশা তোমাকে আনতে হবে।[১৪]

কিংবা

তুমি মরবে না — হে পান্থ মরবে না,
অপমৃত্যুর কোন নাগপাশে
তুমি ধরা পড়বে না।
তিমিরান্তের অপেক্ষাটুকু তোমাকে মানতে হবে[১৫]

আসলে এভাবেই উত্তরণ সম্ভব। আর এই রাত্রির অবসান ঘটে একটি প্রত্যাশিত নতুন ভূ-খণ্ডের আবির্ভাবের মধ্যেই। যে-কবি —'মুক্তি নেই অরণ্য ধূলিতে/মুক্তি নেই আকাশে আকাশে' বলে মুক্তি-প্রয়াসী হয়েছেন; তিনিই এক বৃহত্তর প্রাপ্তিতে উত্তরণের কথা বলেন এভাবে —'সহসা অচেনা

দীর্ঘ পথযাত্রা শেষে/উত্তরণ অন্য এক মানুষের দেশে' (এপার ওপার)। সিকান্দার আবু জাফর এই নবতর উত্তরণের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন *প্রসন্ন প্রহরে;* আর *তিমিরান্তিক*-এ এসে কবির সেই স্বপ্ন যেন প্রোজ্জ্বল বাস্তবতায় রূপ লাভ করে। সুতরাং কুটিল রাত্রির মধ্যে ভগ্নরেখ আজ সুস্পষ্ট—

> কুটিল রাত্রির দেহে ধরেছে ফাটল।
> এখন কাঁপছে তার প্রাচুর্যের চাঁদ:[১৬]

ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসনের অবসান হয়েছে। পাকিস্তান-নামক বহুপ্রত্যাশিত রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। সিকান্দার আবু জাফরের চেতনায় পাকিস্তানের অভ্যুদয় মূলত তাঁর স্বদেশ চেতনারই নামান্তর। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো সিকান্দার আবু জাফরের অন্বিষ্ট হয়ে উঠলো এ পর্যায়ে। আরো অনেকের মতো তিনিও মনে করলেন *মুসলমানিত্বের জাগরণ* পাকিস্তানবাদের মধ্যেই সম্ভাবিত হবে। আর এ সূত্রেই তাঁর স্বদেশচেতনা *আপ্রথম* প্রোথিত হয়ে যায় পাকিস্তান নামক নতুন ভূখণ্ডকে ঘিরে। *সুতরাং* অত্যাচারী ইংরেজ আজ তিরোহিত। অশুভ শক্তির অত্যাচার নিপীড়ন তার অসম বিন্যাসের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াতেই আজ নিশ্চিহ্ন। কারণ, 'তোমার শক্তির চাপে যেখানে ভেঙেছ তুমি/মানুষের একান্ত আশ্রয়/সে-পুণ্য সমাধি-তীর্থে যোগ্য পুরস্কারে/ এবার তুমিও হবে নিরাশ্রয়' (নবাঙ্কুর)। এটিই পৃথিবীর আবহকালের ইতিহাস। শোষকের কৃপাণ ভূ-লুণ্ঠিত হতে বাধ্য; সুতরাং ধর্মভিত্তিক কাঠামোয় নির্মিত স্বপ্নের পাকিস্তানই আজ তাঁর কাছে একান্তভাবে কাম্য। আর তার নব সূর্যোদয় মানুষের উদ্যম আর আশার সন্নিকটে—

> অন্ধকার ফাটলের লক্ষ লক্ষ মুখে
> অজ্ঞাত বীজের বুকে প্রভাতের জেগেছে অঙ্কুর
> প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য নহে বেশী দূর॥[১৭]

আসলে এই সামষ্টিক চেতনাই সিকান্দার আবু জাফরের কাব্যের প্রাণসূত্র। মানুষ, মানুষের সাংগ্রামিক জনপদ, প্রতিরোধ ও আশা আকাঙ্ক্ষার এক দুর্নিবার বাকশিল্প হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতা। মানুষের অস্তিত্ব ও অধিকার যখনই বিপর্যস্ত হয়েছে কবির চেতনাও হয়েছে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধমুখী। প্রথাগত রোম্যান্টিক অনুবর্তনে তিনি ভেসে যাননি। 'সিকান্দার আবু জাফর চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট দশকের কবি, প্রেরণায় বিশ্বাসী, রোম্যান্টিক প্রবৃত্তি তাঁর জন্য নয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, আন্দোলন, সংগ্রামপীড়িত এক বিক্ষুব্ধ যুগের প্রতিনিধি তিনি'।[১৮]

সেজন্যই জনতাসংলগ্ন হতে হতে কবি জনতার মিছিলের অগ্রভাগে গিয়ে দাঁড়ান। আর তাঁর রোম্যান্টিকতার ব্যতিক্রমী প্রসারণ লক্ষ করা যায় জনতাপ্রেমে। জনতাসংলগ্ন কবির উচ্ছ্বাস আর আকুতির বৈভব তাঁকে এক নিবিড় রোম্যান্টিসিজমে চিহ্নিত করে দেয়। কারণ 'আন্দোলনে এবং মিছিলে সিকান্দার আবু জাফরের নিশ্চিত অংশগ্রহণ, সাহিত্যকর্মী হিসেবে সম্পাদনা এবং স্বাধীনতার বিশ্বাসীদের একজন হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কর্তব্যপালন, তাঁকে সকল মহলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করেছিল, কিন্তু কবি হিসেবে তিনি ছিলেন জনতার কবি, জনগণ তাঁর কবিতার প্রধান বিষয়, জনতার জন্যে কবিতা রচনায় তাঁর আনন্দ ও স্ফূর্তি ছিল অকপট, স্বতোৎসারিত'।[১৯] সেজন্য *প্রসন্ন প্রহরের* বন্দিদশা ও আঁধারের অবসান *তিমিরান্তিকে* অপসৃত হলেও কবির জিজ্ঞাসার উৎস-মুখে থাকে

প্রশ্নচিহ্ন। ধর্মভিত্তিক দ্বিজাতিতত্ত্বের নিরিখে পাকিস্তান-নামক রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলেও ধর্মবোধের মধ্যে মুক্তি অসম্ভব। কারণ কবি জেনেছেন —'তোমার মাটির বুকে শ্রাবণের তৃষা/আমার আকাশে অশ্রু-টলমল মেঘ,/অন্তহীন এই মহাব্যবধান ঘিরে/কখনো কি সেতু বাঁধা হবে দীর্ঘশ্বাস?'[২০] সুতরাং এক উপনিবেশ থেকে ভিন্ন এক উপনিবেশের ছায়ায় আত্মবিকাশ ও অধিকারের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়, এ-সত্য এ-পর্বে কবি জেনে গেছেন—

আমার সত্তাকে ঘিরে এই অপমান
কেন আমি সয়ে যাবো ভিক্ষার আশ্বাসে?
তোমার ছায়ায়
আমি তো চাই না কভু আমার বিকাশ।
আমি চাই আমার গণ্ডিতে
আপনাকে রূপে রসে পূর্ণ করে নিতে।[২১]

আসলে পাকিস্তানি উপনিবেশ-আক্রান্ত ষাটের দশক এক আত্মঘাতী অন্ধকার নিমজ্জিত। ধ্বংসাত্মক মনোবৃত্তি, দ্রোহ, সমাজবিচ্ছিন্ন দুঃখবাদ, শৃঙ্খলারহিত এক চূর্ণিত সত্তায় ষাটের কবিরা বলয়িত ছিলেন। সিকান্দার আবু জাফরকে এ আত্মভূক সময় স্পর্শ করলেও রফিক আজাদ, আবুল হাসান কিংবা শহীদ কাদরীর মতো মথিত করেনি। ষাটের কবিদের মধ্যে যে প্রথাবিরোধী, ক্ষয়িষ্ণু জীবনাদর্শ সেটি সিকান্দার আবু জাফরের মধ্যে অনুপস্থিত। বিশেষ করে 'স্যাড জেনারেশন' কিংবা 'বিট জেনারেশনদের' মতো তাঁর কাব্যাদর্শ বলয়িত হয়নি। তবে কবি সময়ের স্রোতধারায় রূপান্তরিত হয়েছেন। এ-রূপান্তর কবির মানসলোকের বিবর্তনধর্মিতার মধ্যেই নিহিত। কোন প্রকার মতাদর্শ কিংবা সাহিত্যিক আন্দোলন এর সঙ্গে যুক্ত নয়। এখন কবি জেনে গেছেন *তিমিরান্তিকের* এই মায়াচ্ছন্ন আলো মূলত আলেয়া। 'অদ্ভুত আঁধারে' ঘিরেছে তাঁর সময়। সেখানে বাকরুদ্ধ, শ্রবণরহিত পারিপার্শ্বিকের চাপ; বিস্তৃত কবরখানায় সমাহিত কবির স্বদেশ, শিল্পবোধ এবং অস্তিত্ব-পরিচয়। কেননা —'আমি বাস করি আজো অনেকের সাথে/নির্জন বধির এক যুগজীর্ণ কবরখানায়'।[২২] তথাপি কবির বিশ্বাস, সমাধিক্ষেত্র মানুষের শবাধার হতে পারে না। বৃহন্নলাবৎ অজ্ঞাতবাসের শক্তিসঞ্চয়ের মতই যেন 'সমাধি-নৈঃশব্দ্য ভেঙে দুর্জয় আক্রোশে/অবিরাম প্রস্তুতি এখানে'।[২৩] আর কবিও তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাসে নিশ্চিত—

মানুষের অকল্যাণ লাশ হবে
সেদিন সেখানে।
শকুনের আয়ু নিয়ে
আমি সেই শুভদিন গুণেই চলব।[২৪]

লক্ষণীয়, অশুভ শক্তির প্রতীক এই শকুনকে কবি উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তে শুভ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে চান। এই 'শকুন' বাংলা কবিতায় এক বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় শকুনের ব্যবহার বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনায় রূপায়িত। জীবনানন্দের কবিতায় শকুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালের অসুস্থ পৃথিবী, ক্ষয়িষ্ণু মানবাত্মার উপর সাম্রাজ্যবাদী অপচ্ছায়া কিংবা কখনো উপনিবেশ-আক্রান্ত কবিপ্রাণের পীড়নক হিসেবে চিহ্নিত —'মাঠ থেকে মাঠে মাঠে — সমস্ত দুপুর

ভ'রে এশিয়ার আকাশে আকাশে/শকুনেরা চড়িতেছে' (জীবনানন্দ দাশ, শকুন, *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)। সিকান্দার আবু জাফরের কাব্যে শকুন মূলত ঔপনিবেশিক অশুভ শক্তির প্রতীকরূপেই চিহ্নিত। বলা প্রাসঙ্গিক শকুনকে কবি একটি যুগজীর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে তাঁর *শকুন্ত উপাখ্যান* (১৯৫২) নাটকেও ব্যবহার করেছেন। অশুভের সঙ্গে শুভ-র এই দ্বন্দ্বে অশুভের ইতিবাচকতাকে গ্রহণ করেই সংগ্রাম চালাতে হয়। তাই কবিও শকুন-সমান আয়ু নিয়ে একটি শুভদিনের প্রহর গুনবেন. অবশ্য সেটি নির্জীব, নিষ্ক্রিয়রূপে নয়, শক্তি ও সংগ্রামের মোকাবেলাতেই। এ-কারণেই কবির উপহাস ও বিদ্রূপ ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে দ্বিধান্বিত নয়—

বুক থেকে দেহ থেকে
খুলে নাও হাড়গুলো
ঘাড় ভেঙে আরো নাও রক্ত.
রক্ত-হাড়ের স্বাদে তোমাদের জিহ্বা
তার সাথে সবটুকু কলজে
পাথরের মত হবে শক্ত।[২৫]

'যেহেতু হিসাব নেবার দিন এখনো আসেনি', সেহেতু কবি আরো সহ্য করে যাবেন। মানুষের সর্বশেষ বিশ্বাসহীনতার সীমা ভেঙে যাবার আগ পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ করবেন কবি। কারণ শিল্পী হিসেবে যে-মানুষকে তিনি রূপায়িত করেন, মানুষের শক্তিতে রাখেন বিশ্বাস, তাকে মুহূর্তের ধৈর্যহীনতায় তিনি ভেঙে দিতে চান না। তাহলে সেটি হবে মানবতারই নির্লজ্জ পরাজয়। এভাবেই কবি সিকান্দার আবু জাফর সময়ের বিবর্তনের ধারায় নতুন নতুন মূল্যবোধের বিপরীতে সঞ্চিত অকল্যাণের মধ্যে নিজের পরিবর্তন ও জিজ্ঞাসাকে প্রকট করে তোলেন। তথাপি এক গভীর দ্বান্দ্বিক চেতনায় তিনি নিমজ্জিত হন—

ভালো-মন্দের নূতন মূল্য-চেতনা :
আমিও সে স্রোতে ভাসছি ;
এখনও হয়তো সকল নিভৃত মর্ম
হয়নি কীটাণুদষ্ট
সে-কথাও তবু বারবার মনে ভাবছি।[২৬]

তিমিরান্তিকে কবি এই বহুবিধ মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে ক্রমশ উচ্চকিত ও বিদ্রূপপরায়ণ হয়ে ওঠেন। এ-বিদ্রূপ যতটা না সমাজের প্রতি তার চেয়ে বেশি আত্মমুখী। মধ্যবিত্তের জীবনতৃষ্ণায় পতিত কবির প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি আশাভঙ্গের মধ্যে বলয়িত। ঈদের দিন, রাত্রির অস্ত্র, তেতলার মেয়েটি, দ্বন্দ্ব. বেহেশতী মেওয়া, নায়িকা প্রভৃতি কবিতায় কবির দ্বন্দ্ব, বিদ্রূপ ও বাক্যবাণ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এক্ষেত্রে কবির বক্তব্য সমাজমনস্কতা থেকেই ধীরে ধীরে স্যাটায়ারের দিকে ধাবিত হয়েছে — 'নজরুল ইসলাম থেকে যাত্রার সূচনা সিকান্দার আবু জাফরের; ক্রমশ বিষ্ণু-দের কাছে তাঁর ঋণ বরং বড়ো হয়ে উঠেছে- সেই ঋণচিহ্ন কাব্যকুশলতায় কখনো, ব্যঙ্গোচ্চারণে কখনো মুদ্রিত।'[২৭] কিন্তু বিষ্ণু দে-র উচ্চ মননশীলতা ও বুদ্ধিবাদী কটাক্ষ তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। মূলত এ ব্যঙ্গপ্রবণতা চল্লিশের দশকের কাব্যপ্রকরণে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। আহসান হাবীব এবং পরবর্তীকালে আবদুল

গণি হাজারী প্রমুখের কবিতায় এর রূপায়ণ লক্ষ করা যায়। আহসান হাবীবের কবিতায় মধ্যবিত্তের কৃত্রিমতা, আত্মাভিমান, নাগরিক জীবনের কঠোর বাস্তবতা ব্যঙ্গাত্মক প্রক্রিয়ায় রূপাবয়ব পেয়েছে —'আমরা যখন হেঁটে যাব/আমার বাহুটা জড়িয়ে থেকো তোমার ডান হাতে/মেম সাহেবরা ঐরকম চলে কিনা' (আহসান হাবীব, কোনো বাদশা'যাদীর প্রতি)। সিকান্দার আবু জাফরের কবিতাতেও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কটাক্ষ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। *বৈরী বৃষ্টিতে*-র কবি অনেক বেশি ব্যঙ্গপ্রবণ, কটাক্ষময়, বক্তব্যে উচ্চকিত।

স্বপ্নের পাকিস্তানের স্বাধীনতা এ-জাতির মুক্তি আনেনি; বরং জাতির ভাগ্যাকাশের বৃষ্টিপাত বৈরিতায় প্রতিপন্ন। 'বৈরী বৃষ্টিতে' সিকান্দার আবু জাফরের সেই মোহভঙ্গের প্রতিক্রিয়ারই ফসল বলে মনে হয়। "সাতচল্লিশ-পূর্ববর্তী অর্থাৎ পাকিস্তান আন্দোলনকালের কবিতাবলীকে তিনি 'প্রসন্ন প্রহর' আখ্যা দিয়েছেন! এবং পাকিস্তানকালের প্রথম সাত বছরের (১৯৫৪ পর্যন্ত) কবিতাকে 'তিমিরান্তিক' বলে চিহ্নিত করেছেন! পরবর্তীকালের কবিতাবলীর 'বৈরী বৃষ্টিতে' নামও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।"[২৮] সুতরাং আজকের এই *বৈরী বৃষ্টিতে* কবি এ-যাবতকালের হিসেবের খাতা খুলে বসবেন এটাই স্বাভাবিক—

তবে কি হয়েছি ব্যর্থ?
সহস্রবার প্রশ্ন জেগেছে চিত্তে;
দোষে-গুণে ভরা মানুষকে নিয়ে বিশ্বে
বাঁচার প্রবল তৃষ্ণা
তবে কি মিথ্যে—নিরেট কঠিন মিথ্যে?[২৯]

এখন তুমি ঘুমোও, ঈদের চিঠি, খেলনা, পক্ষান্তর প্রভৃতি কবিতায় এই ব্যঙ্গাত্মক মনোবৃত্তি বক্তব্যপ্রধান পংক্তিমালায় বিধৃত হয়েছে। 'এখন তুমি ঘুমাও' কবিতায় তারই রূপায়ণ—'ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখবে/চাউল এসেছে ঘরে/তেল নুন চিনি অনেক এসেছে আরো/দুধ মাছ আর খাসীর মাংস/এনেছি জোগাড় করে' (এখন তুমি ঘুমাও, *বৈরী বৃষ্টিতে*)। সেই সঙ্গে কবি যেন কিছুটা হতাশও। কোন হন্তারকের আঘাত ব্যতিরেকেই কবির বুকের ভিতরকার রক্ত প্রগাঢ় হয়ে ওঠে বক্তব্যে—

আমার হৃদয়ে কেউ তো হানেনি
অস্ত্র
তবু এ রক্ত — বুকের ভিতরে কেন থইথই
রক্ত![৩০]

কিন্তু আজ আর কবি সংশয়মুক্ত নন। চারকোটি মানুষের আত্মার বন্ধনের শৈথিল্য ও ভাগ্যবিপর্যয় কবিকে ভ্রান্তির কথাই স্মরণ করায়—

চারকোটি মানুষের বুকভরা সঙ্গীত
ক'টি ভাঙা অস্থির যন্ত্রে
সুর তার দুর্মর অবিচল তালে বাঁধা
মৃত্যুর সম্মোহ মন্ত্রে।

সেই সুর হ'ল বুঝি জোনাকীর রাত্রি।
পেঁচকের শ্রান্তিতে ভ্রান্ত কি যাত্রী?
বারবার সেই ভয়ে দুলছি।[৩১]

সুতরাং প্রকৃতির সৌন্দর্য আজ কবি হৃদয়ে প্লাবন ডাকে না; স্বপ্নহীন নৈরাশ্যের গোধূলির মধ্যে প্রকৃতিলোকও যেন 'এক শূন্যগর্ভ ইতিহাস'—

এ-আকাশ এখন এক
দুর্বোধ্য ইমারত;
ঔপনিবেশিকের উপমাবিহীন
কালো হৃদয়ের মত
কালো মেঘের কিউবিক স্থাপত্য এ-আকাশ।[৩২]

আর এ-সূত্রেই হয় ঈশ্বর ও শয়তানের সুপ্রাচীন দ্বন্দ্ব; নাকি শয়তানের পালায় আত্মা বিক্রয়ের পালা? শয়তান ও ঈশ্বরের বর্ণচোরা স্বভাব এবং বিপরীত রূপান্তরে কবির কণ্ঠও যেন অনেকটা অ-স্থিত, উচ্চকিত—

ঈশ্বর আছেন বলে শয়তানও আছে
আর আছি আমরা সকলে;
আমাদের দিন কাটে — দিনে দিনে দেহ প্রাণ ফাটে
ঈশ্বরের অশরীরে শয়তানী থুতু-ঢাকা দদ্রু কণ্ডূয়নে।[৩৩]

এই ঈশ্বরচিন্তা ক্রমশ রূপকের মাত্রা পায় *কবিতা ১৩৭২* (১৯৬৮) কাব্যেও। এ-ঈশ্বর মূলত ঔপনিবেশ-শৃঙ্খলিত কবি আত্মার বিপরীত শত্রু — "হায় অদৃষ্ট হায় অদৃষ্ট / কোথা থেকে এলো এত ঈশ্বর?/ কত ঈশ্বর! কত ঈশ্বর!!" বস্তুত *কবিতা ১৩৭২* গ্রন্থ থেকেই সিকান্‌দার আবু জাফর জনতার কবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন। এ পর্যায়ে তাঁর ভাষা ও বক্তব্য সংগ্রাম ও মিছিলের ভাষার চারিত্র পেতে থাকে। অবিরল জনস্রোতের মতই তিনি বলতে থাকেন—

জনতার সংগ্রাম চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে
বাঁচবার অধিকার কাড়তে
দাস্যের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।[৩৪]

এ-প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পরিণতি *বৃশ্চিক লগ্ন* (১৯৭১) ও *বাঙলা ছাড়ো* (১৯৭১) কাব্যগ্রন্থে। এ-পর্বের কবিতায় সিকান্‌দার আবু জাফর ব্যক্তিগত উপলব্ধি, অনুধ্যানের জগৎ থেকে সরাসরি নেমে এসেছেন জনতার মিছিলে। গণচেতনা ও বিশ্বাসের এক আত্মঅতিক্রমী প্রক্রিয়াতেই তিনি কবিতায় আমূল রূপান্তরিত হন। স্বাজাত্যবোধ, দেশমাতৃকা, ও পাকিস্তানি শোষণ নিপীড়নের বিরুদ্ধে শক্তিশালী

প্রতিরোধ গড়ে তোলে কবির পংক্তিমালা। বৃশ্চিক-লগ্ন, অবাক-দেশের জাতীয় সংগীত, অবাক দেশের বিলাপ-সঙ্গীত, অবাক দেশের নাম-সঙ্গীত প্রভৃতি কবিতায় কবির ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, প্রতিবেশ নির্মিতির নাটকীয়তায় গণনাট্যগীতির আদল পেয়েছে।

আমাদের সব আছে ভাই সব আছে
সাজ আছে রূপসজ্জা আছে
হাড়ের নলে মজ্জা আছে
গরজ মত গলায় গলায়
হুক্কাহুয়া রব আছে।।[৩৫]

অথবা

এমন দেশটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি
পুণ্যভূমি হ'ক বা না হ'ক
সে যে বধ্যভূমি
সে যে তোমার বধ্যভূমি
সে যে আমার বধ্যভূমি।।[৩৬]

সুতরাং প্যারোডি হিসেবে তৎকালীন স্বদেশের এক অপূর্ব চিত্ররূপ তাঁর এ কবিতাগুলো। বলা প্রাসঙ্গিক, কবির কাব্যভাবনাও ক্রমান্বয়ে এ লৌকিক ও গণসঙ্গীতের ভাষার সঙ্গে বিষয়ানুগ হয়ে উঠলো। ছন্দ হয়ে উঠলো *লোকজ অর্থাৎ ছড়ার ছন্দেরই* সমগোত্রীয়। আর স্বভাবতই তিনি রূপকের অন্তরালে সমকালীন স্বদেশকে তুলে ধরেছেন। জননী-জন্মভূমির জন্য কবির আকুতি প্রবলতর রূপ লাভ করলো *বাঙলা ছাড়ো* কাব্যে। পরাধীনতার গ্লানি, স্বাধীনতা-স্পৃহার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ও স্বদেশপ্রেমের বিশিষ্ট প্রমাণ হয়ে আছে এ-পর্বের কবিতাগুলো। আর তাই স্বাধীনতার স্বপ্ন-প্রত্যাশী কবি যুগে-যুগে বাংলার আকাশে প্রভাব-বিস্তারী অপশক্তির বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—

কাজ কি দ্বিধার বিষণ্নতায়
বন্দী রেখে ঘৃণার অগ্নিগিরি!
আমার বুকেই ফিরিয়ে নেবো
ক্ষিপ্ত বাজের থাবা;
তুমি আমার জলস্থলের
মাদুর থেকে নামো,
তুমি বাঙলা ছাড়ো।[৩৭]

উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত এক করুণ চিত্র সিকান্‌দার আবু জাফরের কবিতায় ভাষারূপ পেয়েছে। অসহায়, নিপীড়িত, অত্যাচারিত পূর্ববাংলার প্রতি বিশ্ব ও বিশ্বনেতৃবর্গের যে সহানুভূতির আশীর্বাদ সেটি কবির বর্ণনায় ভাষারূপ পেয়েছে — "বিশ্বের প্রতিটি দেশ, অগণিত বিশ্ববাসী/ছুঁয়েছে হৃদয়-তপ্ত দাক্ষিণ্যের হাতে/নিরুপায় পূর্ববাংলাকে" (শকুন পাঠিও) আর পাকিস্তান-রাষ্ট্রের সম্মোহনী মোহ এতদিনে ভেঙে গেছে — "ডুবে গেল সম্মোহিত চেতনার আদিগন্ত চর/প্রসারিত ঔপনিবেশিক মানচিত্র যখন/চিনলো সবাই নির্ভুল" (কালান্তর সেতু)। তাই এখন কবিও মীমাংসিত—

ঔপনিবেশিক মানচিত্রে তখন
সুস্পষ্ট নিরেট প্রাচীর।
এই পবিত্র ধর্মের দেশে তারপর
নির্বিবাদে মানুষের বিস্মৃত ধর্মের
সুপ্রাচীন স্বাদ।[৩৮]

সিকান্দার আবু জাফরের কবিতা নানা সংগ্রাম-বিক্ষোভ-উপহাস-বিদ্রূপে ধীরে ধীরে এই রূপান্তরের মাধ্যমে জনতার মিছিল সংলগ্ন হয়ে উচ্চকিত হয়। যদিও কবি প্রকরণনিষ্ঠ নন, শিল্পের নিখুঁত দাবি পূরণের জন্য তিনি কলম ধরতেও চাননি[৩৯] তবু প্রকরণ কবির স্বতঃস্ফূর্ত বক্তব্য ও ভাষাভঙ্গিকে ধরেই কেন্দ্রীভূত হয়। কারণ কবিরা যে বোধ বা ভাবনাকে রূপায়িত করেন অনিবার্যভাবে তা হয়ে ওঠে শব্দাশ্রিত ও ছন্দময়। সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার ভাষাভঙ্গি ও শব্দচয়ন কবির মানস-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ। প্রথমদিকের কবিতায় তাঁর ভাষা অনেকটাই সংহত, গম্ভীর ও স্বাপ্নিক। এই পর্বে অক্ষরবৃত্তীয় *চলনই কবির স্বাচ্ছন্দ্য।* কিন্তু শেষদিকে এসে তাঁর কবিতা যতই জনতা-সংলগ্ন হয়েছে ভাষাও হয়েছে ঋজু, একরৈখিক, প্রত্যক্ষ, উত্তাপময় ও *লৌকিক* ছন্দাশ্রিত। তবে তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে আগাগোড়া সাযুজ্যপূর্ণ উপমা, প্রতীক রূপক আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল প্রতিভারই স্বাভাবিক নিয়মে।

প্রতীক সংবেদনশীল কবিচিত্তের প্রকাশ-মাধ্যম। বক্তব্যের ব্যঞ্জনাকে মূর্তরূপ দিতে কবি প্রতীককে মোক্ষম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন। সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ কবির সাংগ্রামিক জনসংলগ্ন চেতনার অনুষঙ্গরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। রাত্রি ও রাত্রিচারী অনুষঙ্গ যেমন, পেঁচক, কুক্কুর, শেয়াল, বাদুড়, শকুন, শ্মশান প্রভৃতি প্রতীক কবির কবিতায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে আছে। এই প্রতীকসমূহ প্রায়শ অকল্যাণ, অশুভ শক্তির সহায়ক হিসেবে, কখনো উপনিবেশ-শৃঙ্খলিত মানবচৈতন্যের বিভ্রমের রূপায়ণে ব্যবহৃত। কয়েকটি দৃষ্টান্ত—

রাত্রি ও শকুন :

সে-রাত্রির নীরবতা রোমাঞ্চ আনেনি
রক্তপায়ী শকুনেরা দিয়েছিল হানা[৪০]

শ্মশান :

সে-রাত্রির আলিঙ্গন বসন্ত আনেনি
এনেছিল শ্মশানের চরম রিক্ততা[৪১]

জোনাকি, রাত ও পেঁচক :

সেই সুর হ'ল বুঝি জোনাকীর রাত্রি
পেঁচকের শ্রান্তিতে ভ্রান্ত কি যাত্রী?[৪২]

শকুন ও শেয়াল :

রাত্রি জাগে শকুন এবং শেয়াল
নাকি সুরের কান্না কেঁদে
হুক্কা হুয়া ডেকে
আঁধার ভিতে জমিয়ে তোলে
অমঙ্গলের দেয়াল;[৪৩]

লক্ষণীয়, ১নং দৃষ্টান্তে রাত্রি ও শকুনের ব্যবহার ইংরেজ উপনিবেশকালের বাস্তবতাকে প্রকাশ করছে। শেষোক্ত দৃষ্টান্তেও ব্যবহৃত হয়েছে একই প্রতীক। কিন্তু সেটি পাকিস্তানি উপনিবেশকালের চিত্র। সুতরাং এক উপনিবেশ থেকে আরেক উপনিবেশের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য না-থাকার কারণেই সম্ভবত কবির প্রতীকের পরিবর্তন ঘটে না। শুধু আন্দোলন ও অভিজ্ঞতার মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয়ে থাকে বলে কবির প্রকাশ-মাধ্যমের ছন্দটি শুধু বদলেছে। জনতা-সংলগ্ন ও সামষ্টিক চেতনায় বিশ্বাসী কবি বর্তমানের অভিজ্ঞতার জন্য বেছে নেন স্বরবৃত্তীয় ছন্দের কাঠামোটি।

রূপকের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কবির রূপক তাঁর সংগ্রামী চেতনার অনুষঙ্গবাহী হয়ে ওঠে। যেমন—

ব্যাঘ্র-কপিশ অগ্নি-চোখের
শ্বাপদ চাউনি আমাকে দাও,[৪৪]

আবার কখনো কখনো রূপকাশ্রয়ী কবিতাই হয়ে উঠেছে কবির প্রকাশ মাধ্যম। অবাক-দেশের জাতীয় সঙ্গীত, অবাক দেশের নাম-সঙ্গীত, অবাক দেশের বিলাপ সঙ্গীত, অবাক দেশের প্রেম-সঙ্গীত, বৃশ্চিক-লগ্ন প্রভৃতি কবিতা রূপকাশ্রয়ী কবিচেতনারই বহিঃপ্রকাশ।

কবির উপমাজগতও সচেতনপ্রসূত নয়। তবে কখনো কখনো এরকম অভিনব উপমা-বিন্যাসে কবি আমাদেরকে উপনিবেশ শৃঙ্খলিত চৈতন্যের যন্ত্রণাকে রেখায়িত করেন—

ঔপনিবেশিকের উপমাবিহীন
কালো হৃদয়ের মত
কালো মেঘের কিউবিক স্থাপত্য এ-আকাশ।[৪৫]

সিকান্‌দার আবু জাফরের কবিতায় শিল্প-অন্বেষণ করতে যাওয়াটা আসলে অতিরেক হবে। কারণ শিল্প-সাফল্যে কবিখ্যাতি অর্জন কবির অন্বিষ্ট ছিল না কোনকালেই। মানুষ, সমাজ, মানবতা, স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতির উপর এক সীমাহীন বোধগত দায়বদ্ধতাই কবিকে কাব্যরচনায় আগ্রহী করেছে। আর আমাদের সাংগ্রামিক ইতিহাসের প্রতিটি পর্বে তাঁর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তাঁর কবিতা ও সাহিত্যকর্মকে বিশিষ্ট করেছে। তাঁর কবিতা তাই এক সংগ্রাম-কর্ষিত জনপদের শস্যভূমির ফসল হিসেবেই মূল্যায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তথ্যনির্দেশ

১. ফাল্গুন হ'ত গান, প্রসন্ন প্রহর, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৫

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

৪. সিকান্‌দার আবু জাফর, প্রসন্ন প্রহর, তিমিরান্তিক, বৈরী বৃষ্টিতে গ্রন্থের ভূমিকা, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

৫. আবদুল মান্নান সৈয়দ, 'সমকাল' ,পৌষ ১৩৭২, উদ্ধৃত, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩

৬. সেই রাত্রি, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

৭. রফিকুল ইসলাম, *"আধুনিক কবিতা"*, উদ্ধৃত, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫৩

৮. এ দিনের পাখা, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

৯. জীবনের স্বাক্ষর, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১০. ঘুম ভেঙে যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩

১১. প্রাগুক্ত

১২. প্রাগুক্ত

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. আগামী দিনের স্বপ্ন, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯

১৫. প্রাগুক্ত

১৬. নবাঙ্কুর, তিমিরান্তিক, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫

১৮. রফিকুল ইসলাম, আধুনিক কবিতা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫১

১৯. আবদুল হাফিজ, সিকান্‌দার আবু জাফরের কবিতা ভুবন, উদ্ধৃত, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮৪

২০. জিজ্ঞাসা, তিমিরান্তিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২১. অধিকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০

২২. ১৩৫৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬

২৩. প্রাগুক্ত

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

২৫. নিষ্কর্ষ, প্রাগুক্ত

২৬. দ্বন্দ্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭

২৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৬

২৮. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, বই (জুন-জুলাই ১৯৭০, ৬ : ৪-৫ সংখ্যা), জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, উদ্ধৃত, *সিকান্‌দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬৯

২৯. সোনা-স্বপ্নের বীজ, বৈরী বৃষ্টিতে, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২

৩০. অভিব্যক্তি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

৩১. ক্ষতচিহ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৩২. কিউবিক স্থাপত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৯

৩৩. ঈশ্বর ঈশ্বর, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৪

৩৪. সংগ্রাম চলবেই, কবিতা ১৩৭২, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

৩৫. অবাক-দেশের জাতীয় সংগীত, বৃশ্চিক-লগ্ন, *সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৩

৩৬. অবাক দেশের নাম-সঙ্গীত, বৃশ্চিক লগ্ন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬১

৩৭. বাঙলা ছাড়ো, বাঙলা ছাড়ো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪

৩৮. কালান্তর সেতু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩২

৩৯. 'বড় কবি ভাল কবি ত দূরের কথা নিছক 'কবি' হবার সাধনাই আমার তেমন জোরালো নয়। আমি শুধু কখনও কখনও কবিতা লিখি এই মাত্র। যা লিখেছি তা যে কবিতা হয়েছে কিনা তা' নিয়েও আমার তেমন দুশ্চিন্তা নেই। তবু হয়ত মন সচেতন বলে কাব্যের নিয়মকানুন আমি সহজভাবেই কিছুটা মেনে গিয়েছি। হয়ত কান অভ্যস্ত বলে ছন্দও তার নিজের পথে এগিয়ে যেতে হোঁচট খেয়ে খেয়ে আধমরা হয়নি।' সিকান্দার আবু জাফর, প্রসঙ্গ-কথা, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

৪০. সেই রাত্রি, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. ক্ষতচিহ্ন, বৈরী বৃষ্টিতে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

৪৩. তখন রাত্রি শেষ, বাঙলা ছাড়ো, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৫

৪৪. দাহ, প্রসন্ন প্রহর, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

৪৫. কিউবিক স্থাপত্য, বৈরী বৃষ্টিতে, প্রাগুক্ত